সাম্যবাদ

‘বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)’–এর মুখপত্র

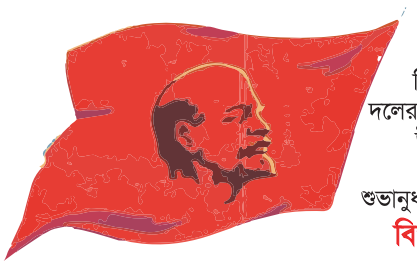

মহান নভেম্বর বিপ্লববার্ষিকী ও দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সকল গ্রাহক, পাঠক, শুভানুধ্যায়ীকে জানাই

বিপ্লবী শুভেচ্ছা

১১ বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৩ web: www.spbm.org মূল্য ৫ টাকা

আওয়ামী লীগ সরকার পদত্যাগ কর নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন দাও

সাধারণ মানুষ মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়েছে অনেকদিন, ডিম আর ব্রয়লার মুরগী ছিল মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তের প্রোটিনের উৎস– তার দাম এখন আকাশ ছুঁয়েছে। গরীবের ডাল-ভাতও গরীবের স্তর পার হয়ে মধ্যবিত্ত হয়েছে। সম্বল ছিল আলু, তার দাম এখন চালের চেয়ে বেশি। অথচ এই কোন একটা জিনিসেরই অভাব দেশে নেই, উৎপাদনে কোন ঘাটতি নেই।

জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, কিন্তু বাড়েনি মানুষের আয়। দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পখাত গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। শুধু গার্মেন্টস নয়, দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে দেশের বেশিরভাগ মানুষের। গার্মেন্টসের শ্রমিকরা রাস্তায় নেমেছেন, গুলি খেয়েছেন। তারা মরার মতো বেঁচে থাকার চেয়ে প্রতিবাদ করে মৃত্যুবরণকে শ্রেয় মনে করেছেন।

এই যখন দেশের পরিস্থিতি, মানুষ যখন সকল দিক থেকে বঞ্চিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত; এই সময়ে দেশের রাজনীতি এক সংকটকাল অতিক্রম করছে। রাজনৈতিক মতামত নির্ভয়ে ব্যক্ত করার মতো কোন পরিবেশ দেশে নেই। গত ২৮ অক্টোবর স্বেচ্ছাচারী আওয়ামী লীগ সরকার বিএনপির মহাসমাবেশের উপর নির্মম পুলিশী অত্যাচার নামিয়ে এনেছে। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিরোধীদের ডাকা হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচিতেও আওয়ামী লীগ গ্রেফতার-নির্যাতন চালায়। এই কয়েকদিনে বিএনপির শীর্ষ প্রায় সকল নেতাকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। বেশিরভাগ নেতাকর্মী ঘরছাড়া, এলাকাছাড়া।

তাদের পরিবার-পরিজনরা উদ্বিগ্নতায় ও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। ২য় পৃষ্ঠায়

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা কেন চাই

(গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন কাঠামো ঠিক করার জন্য একটি মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। আমরা জানি, এই মজুরি বোর্ডে মালিক, শ্রমিক ও সরকার তিনটি পক্ষ কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে একটি পক্ষই থাকে– সেটি মালিকপক্ষ। মালিকরা যা চান সেটাই হয়। এবারেও মজুরি বোর্ড গঠনের পর গড়িমসি চলেছে অনেকদিন। সর্বশেষ শ্রমিক ও মালিকদের পক্ষ থেকে দুটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। মজুরি বোর্ড সর্বশেষ নিম্নতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা ঘোষণা করেছে। এই প্রস্তাব শ্রমিকরা মেনে নেয়নি। গত কয়েকদিন ধরে গার্মেন্টস শিল্প এলাকাগুলোতে প্রবল শ্রমিক বিক্ষোভ চলছে, সাথে চলছে পুলিশের অত্যাচার। ইতিমধ্যে পুলিশের গুলিতে তিনজন গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৫ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি তোলা হয়েছে।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি সম্পর্কিত একটি লেখা বাংলাদেশ ‘শ্রমিক-কর্মচারি ফেডারেশন’ এর মুখপত্র ‘শ্রমিক বার্তা’ পত্রিকার অক্টোবর ২০২২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমরা সাম্যবাদের পাঠকদের জন্য লেখাটি প্রকাশ করলাম।)

একজন শ্রমিক নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করার বিনিময়ে যে অর্থ পায় সহজ কথায় তা-ই মজুরি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) ঘোষণা মতে, সর্বনিম্ন মজুরি আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক ও তার পরিবারের ভরণপোষণ, আবাসন, চিকিৎসা সর্বোপরি মনুষ্যোচিত জীবনযাপন ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে (১৩১নং অনুচ্ছেদ)। দেশের সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব বলা হয়েছে। ২য় পৃষ্ঠায়

এখন প্রশ্ন হলো, বর্তমান বাস্তবতায় একজন শ্রমিকের যুক্তিসংগত ন্যূনতম মজুরি কত হতে হবে? **২য় পৃষ্ঠায়**

আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনে বামজোট অংশগ্রহণ করবে না

উন্নত নৈতিকতার ভিত্তিতে দেশের যুবক-তরুণদের জাগিয়ে তুলে গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করতে হবে বামপন্থীদের

[গত ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় সমাবেশে জোটের তৎকালীন সমন্বয়ক ও বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানার বক্তব্য কিছুটা সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হলো]

বন্ধুগণ,

আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ, সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন, জিনিসপত্রের দাম কমানোসহ ১০ দফা দাবিতে বামজোট এই সমাবেশ আহবান করেছে। সমাবেশে উপস্থিত বিভিন্ন বামপন্থী দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, সারাদেশ থেকে আগত শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, ভূমিহীন, গৃহহীন, ক্ষেতমজুরসহ যারা আজকের এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন, বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে ও আমাদের দল বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

বন্ধুগণ,

আমরা একথা স্পষ্ট করেই বলেছি যে, ২০১৪ সালে ও ২০১৮ সালে কোন নির্বাচন হয়নি। নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে, মানুষকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। আমরা সুনির্দিষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি তুলেছি। আমরা বলেছি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হলে সে নির্বাচনে বামজোট অংশগ্রহণ করবে না। আওয়ামী লীগ সংবিধানের কথা তুলছে। এটা কোন যুক্তিই হতে পারে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আওয়ামী লীগই লড়েছে। ত্রয়োদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে সেটা সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছে। আবার এই আওয়ামী লীগই পরবর্তীকালে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই পদ্ধতি বাতিল করেছে। আদালত তাঁর রায়ে বলেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামী দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৩য় পৃষ্ঠায়

সাম্যবাদ
১১ বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৩

আওয়ামী লীগ সরকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনের উপর এই জঘন্য অত্যাচার অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ২৮ অক্টোবর ও তার পরবর্তী নয়দিনে নয় হাজারেরও বেশী বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে, ৭ জনকে হত্যা করা হয়েছে। মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে নিরপরাধ ২ জন শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে, আহত হয়েছেন শত শত শ্রমিক। এসকল বর্বরোচিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার নজিরবিহীনভাবে আন্দোলনের উপর নিদারুণ আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। বাংলাদেশে ৬৮টি কারাগারে বন্দী ধারণক্ষমতা ৪২ হাজার। এই নভেম্বরে সেখানে ধারণক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি বন্দী আছে। সরকারের পদত্যাগ, নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন- এই দাবি আজ আর কোনো নির্দিষ্ট দলের দাবি নয়, গণদাবিতে পরিণত হয়েছে।

দেশের এই অস্থিরতার মধ্যে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপ করছে। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দলগুলো শক্তিসমাবেশ ঘটাচ্ছে ও অধিক সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশে যে রাজনৈতিক শূণ্যতা চলছে তার ফলশ্রুতিতেই এই ঘটনা ঘটেছে। স্বাধীনতার পর ৫২ বছরে যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে, কেউ-ই জনগণের কথা চিন্তা করেনি। জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি হয়েছে, দলীয় নেতাকর্মীদের সুবিধা দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার রাজনীতি হয়েছে– কিন্তু জনগণের রাজনীতি আওয়ামীলীগ-বিএনপি-জামায়াত -জাতীয় পার্টি, ক্ষমতায় থাকা এই দলগুলোর কেউ-ই করেননি। জনগণের কথা কেউ-ই ভাবেননি। রাজনীতি একটা হৃদয়বৃত্তি, একটা উচ্চ নীতি-মূল্যবোধসম্পন্ন সামাজিক ক্রিয়া– সেটা এদেশের মানুষ ভুলতে বসেছে। পরাধীন দেশে পাকিস্তানি প্রায় উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলনের সময় রাজনীতি ত্যাগ শিখিয়েছিল, মূল্যবোধ শিখিয়েছিল। এখনও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ প্রাণ দেন, ভাবেন পরিবর্তন হবে। কিন্তু ক্ষমতায় গেলে কেউ-ই ক্ষমতা ছাড়ার কথা ভাবতে পারেন না। ক্ষমতায় থাকলে যে পরিমাণ লুটপাট, দুর্নীতি, অর্থ ও প্রভাব উপভোগ করেন– এসবের কারণে ক্ষমতাবিহীন রাজনীতি তাদের কাছে অস্তিত্ব হারানোর মতো। প্রশ্ন উঠে, জনগণের জন্য রাজনীতি যদি বিভিন্ন সময়ে আমাদের দেশের ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিবিদরা না করে থাকেন, তাহলে তাদের কাদের জন্য রাজনীতি করেন? কাদের স্বার্থ দেখেন?

এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আওয়ামী সরকার জনগণের কাছে ভীষণভাবে ধিকৃত। একদিকে সরকারের ঔদ্ধত্য, একটার পর একটা আইন প্রয়োগ করে জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ; অন্যদিকে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক বিপর্যয়– এসবকিছু সমস্ত স্তরের জনগণ, বিশেষ করে শ্রমজীবী জনগণকে আওয়ামী সরকারের উপর বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করছে কয়েকটি বড় বড় ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট। সরকারের এদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই কথাটা ঠিক নয়, বাস্তবে এরাই সরকার। এরাই আওয়ামী লীগের তহবিলে অর্থের জোগান দেয়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি। প্রতিমাসে গড়ে দেশ থেকে ৬৪ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। দেশের ব্যাংকগুলো থেকে টাকা লুটপাট করে পুঁজিপতিদের সম্পদ বাড়ছে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের সময় খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে ২২ হাজার কোটি টাকা, বর্তমানে সেটি দেড় লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে প্রকৃত খেলাপি ঋণ ৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে এদেশের বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণি আরও বড় হয়েছে, দলীয় নেতাকর্মী ও আমলাদের একটি অংশ বিরাট সম্পদের মালিক হয়েছেন। তাদেরকে সরকারিভাবে লুটের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে।

এই ব্যবসায়ীদের স্বার্থেই দেশ পরিচালিত হচ্ছে, দেশের সকলরকম নীতি প্রনয়ণ করা হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে সবাই এই পুঁজিপতিদের স্বার্থেই কাজ করেছে। ক্ষমতায় থাকার জন্য বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সাথে অসম চুক্তি করছে, দেশী-বিদেশী কর্পোরেটদের নানারকম সুবিধা দিচ্ছে। ভারতের আদানি গ্রুপের সাথে বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, কী শর্তে ভারত সরকার শেখ হাসিনাকে সমর্থন করছে। নির্বাচন নিয়ে বিদেশী দূতাবাসগুলোর ভূমিকাও আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে। আওয়ামী লীগের অবৈধ, অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী প্রক্রিয়ায় দেশ শাসনের কারণে এদেশে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

২০১৪ ও ২০১৮ সালের প্রহসনের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গত ১০ বছর ধরে গোটা দেশের জনগণের সাথে প্রতারণা করে, গায়ের জোরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে। জনগণের রাজনৈতিক অধিকার বলে আজ কিছু নেই। কারণ আওয়ামী লীগ জনগণকে তার রাজনৈতিক অধিকার দিতে ভয় পায়। নির্দলীয়, তদারকি সরকারের অধীনে একটি আপেক্ষিকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন সংঘটিত হলে আওয়ামী লীগ তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না। রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ার কারণে সে ক্রমাগত পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনীকে ব্যবহার করছে। এটি প্রতিনিয়ত তাকে আরও জনবিচ্ছিন্ন এবং প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল করে তুলছে। ফলে পুলিশ এবং বিভিন্ন বাহিনীর অত্যাচার ক্রমেই বাড়ছে। বাড়ছে নির্বিচার হামলা, মামলা ও গ্রেফতার।

বাম গণতান্ত্রিক জোট ও আমাদের দল বাসদ (মার্কসবাদী) এর পক্ষ থেকে নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন, নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারসহ দুর্নীতি-লুটপাটের বিরুদ্ধে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছি। আমরা নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই, আপেক্ষিকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন চাই। তদারকি সরকারের অধীনে একটি আপেক্ষিকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০১৮ সালে শ্রমিকদের আন্দোলনের চাপে সরকার মজুরি বোর্ড গঠন করে গার্মেন্টস সেক্টরে নতুন মজুরি ঘোষণা করে। যা কার্যকর হয় ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে। মৌলিক চাহিদা, ক্যালরির হিসাব, দেশের পরিস্থিতি, বাজার মূল্য, মালিকদের সামর্থ্য বিবেচনায় শ্রমিকরা এবং আন্দোলনরত শ্রমিক সংগঠনগুলো গার্মেন্টসসহ সকল সেক্টরে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা দাবি করে। কিন্তু এসব দাবি ও যুক্তির পথে না গিয়ে মালিক-সরকার নির্ধারণ করে মাত্র ৮ হাজার টাকা, যা সেই সময়ের বিবেচনায় ছিল অপ্রতুল। তবুও বেতন বৃদ্ধির অজুহাতে বাড়তে থাকে কাজের চাপ। শ্রমিক প্রতি উৎপাদন টার্গেট বাড়ানো হয় দ্বিগুণ-তিনগুণ। হু হু করে বেড়ে যায় বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানিসহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। টাকার অংকে ৫,৩০০ থেকে ৮ হাজার হলেও শ্রমিকদের জীবনে এর কোন সুফল আসেনি। ২০১৯ সালে অক্সফামের এক জরিপে দেখা যায়– 'প্রতি ১০ জন গার্মেন্টস শ্রমিকের মধ্যে ৯ জনই প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে পারেন না।' ২০১৮-২০১৯ সালের তুলনায় গত ৪-৫ বছরে দফায় দফায় সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। ২০১৮ সালের তুলনায় বর্তমানে ডালে ৯৬%, আটায় ৭২%, তেলে ৭৮%, ডিমের ৫০% পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০ টাকার পাউরুটি ১৫ টাকা হয়েছে। চা, পাউরুটি, বিস্কিট, কলা ইত্যাদি যেগুলো নাস্তা হিসাবে শ্রমিকরা খেতেন দাম বৃদ্ধির কারণে এখন সেটুকুও খেতে পারছেন না। গত ৪ থেকে ৭ জুন মিরপুরের পোশাক শ্রমিকরা যে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, তাদের কণ্ঠে একটা কথাই প্রধানত ধ্বনিত হয়েছে–'দ্রব্যমূল্য কমাও, মজুরি বাড়াও।' যেন শুধুই বাঁচবার করুণ আকুতি! মালিকরা সেখানেও ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজেছে মূল সমস্যাকে আড়াল করে। এরপর সরকার ৫ আগস্ট ২০২২ এক লাফে জ্বালানি তেলের দাম সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে লিটার প্রতি ৩৪ থেকে ৪৬ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করল। এ যেন 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা!'

রাতারাতি গাড়ি ভাড়া হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ, ওষুধসহ বাজারের সমস্ত পণ্যের দাম লাগামহীনভাবে বেড়ে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, বর্তমান বেতনে একটি শ্রমিক পরিবারের কোনো রকমে জীবন বাঁচানোও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গবেষকরা বলছেন, একজন ব্যক্তির মাসিক খাবার খরচ লাগে ৫ হাজার ৩৩৯ টাকা। ৪ সদস্যের একটি পরিবারের শুধুমাত্র খাবার খরচ হচ্ছে ২১ হাজার ৩৫৮ টাকা। খাবারের সঙ্গে এক কক্ষের ঘর ভাড়া, গ্যাস-বিদ্যুতের বিল, চিকিৎসা ব্যয়, যাতায়াত, মোবাইল ফোন, সন্তানের লেখাপড়ার খরচ ইত্যাদি সর্বনিম্নভাবে হিসাব করলেও ৩৩ হাজার ৮৪১ টাকা দাঁড়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের হিসাব মতে, নর-নারী নির্বিশেষে গড়ে (পুরুষ ৩৩৬৪ + নারী ২৪০৬/২) ২৮৮৫ কিলোক্যালোরি তাপ উৎপাদনক্ষম খাদ্য প্রয়োজন। হিসাব অনুযায়ী জনপ্রতি প্রতিদিন ২৮০০ কিলোক্যালোরি তাপ উৎপাদন করতে পারে এমন খাদ্যের সর্বনিম্ন বাজার মূল্য ১৭৯ টাকা। মাসে ৫ সদস্যের পরিবারের ২৬,৮৫০ টাকা লাগে। অর্থাৎ দারিদ্র্যসীমার মধ্যে একটা শ্রমিক পরিবারের মাসিক ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় ২৭ হাজার টাকা। সরকারি কর্মচারীদের জন্য পে-স্কেলে সর্বনিম্ন বেতন ১৮,১০০ টাকা। (বেসিক ৮,২৫০ + ৬৫% বাড়ি ভাড়া ৫,৩৬২ টাকা + চিকিৎসা ভাতা ১৫০০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৩০০ +শিক্ষা ভাতা ১৫০০ টাকা + টিফিন ভাতা ৩০০ টাকা + ধোলাই ভাতা ১৫০ টাকা)। তাছাড়া সরকারি কর্মচারীরা রেশন পায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়-একজন পুলিশ কনস্টেবল ১৮ হজার ১০০ টাকা গড় বেতন পেয়েও ১১৫ টাকায় ৩০ কেজি চাল, ৩০ কেজি আটা, ৫ কেজি চিনি, ৮ লিটার তেল, ৮ কেজি ডাল, ১ কেজি পোলাও চাল পেয়ে থাকে। এগুলোর বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকা।

শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পের সক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। বিগত ২০২১-২২ অর্থ বছরে রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশই এসেছে গার্মেন্টস শিল্প থেকে। গত অর্থ বছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৪২.৬১ বিলিয়ন ডলার। যা তার আগের অর্থ বছরের তুলনায় ৩৫.৪৭ শতাংশ বেশি। রপ্তানি ও প্রবৃদ্ধি বেড়েছে ২৮ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপে ৪৬% পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক কারণে বাজারের সীমানা সম্প্রসারণ হয়েছে। বিস্তৃতি ঘটেছে চিলি, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো, তুরস্ক ও রাশিয়ার বাজার পর্যন্ত। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী আশাবাদ ব্যক্ত করছেন–'চলতি অর্থ বছর এ খাত ৫২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে একটি মাইলফলক সৃষ্টি করবে।' এমনকি ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যকে ১০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যে পরিণত করার ভাবনা চলছে। বলার অপেক্ষা রাখে না দেশের গার্মেন্টস মালিকরা যথেষ্ট পুঁজি সঞ্চয় করে বিশ্ব বাজারেও বেশ শক্তিধর প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য করোনাকালে গার্মেন্টস মালিকরা মাত্র ২% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ৯ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনাসহ নামমাত্র সুদে ৩০ হাজার কোটি টাকার শিল্প ঋণের সুবিধা পেয়েছে সরকারের কাছ থেকে। যা আসলে পাবলিক মানি। সরকার গার্মেন্টস মালিকদের জন্য রপ্তানিতে উৎস কর কমিয়ে ০.২৫ করে দিয়েছে। অথচ এই উন্নয়নের অভিযানে করোনাকালে শ্রমিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন করেছে। উন্নয়নের আঁচ তাদের জীবনে পড়েনি। বরং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তীব্র কষাঘাতে দিন দিন দুর্বিষহ জীবনের পাকে বন্দি হচ্ছে। এর কারণ সমস্ত গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বাংলাদেশে শ্রমিকদের বেতন সবচেয়ে কম। 'আইএলও'–এর 'Minimum wages in the global garment industry : Update for 2020' প্রতিবেদন অনুসারে, গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মূল মজুরি বাংলাদেশে ৬৩ ডলার, ভারতে ১৬৮ ডলার, পাকিস্তানে ১১১ ডলার, বেলজিয়ামে ১৭৬৪ ডলার, ব্রিটেনে ১৭৩৪ ডলার, ফ্রান্সে ১৫৫৪ ডলার।

জীবনযাত্রার মানের তারতম্য সত্ত্বেও এই মজুরি বৈষম্য কোনোভাবে যৌক্তিক হতে পারে? বেলজিয়াম, ব্রিটেন, ফ্রান্স শ্রমিকদের এই পরিমাণ মজুরি দিয়েও যে বাজারে যে দামে বিক্রি করে, বাংলাদেশের পোশাকও তো সেই বাজারে একই দামে বিক্রি হয়। তাহলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হবে না কোন যুক্তিতে? তা ছাড়া সিপিডি গবেষণা বলছে–'লাইন প্রতি শ্রমিকের ব্যবহার কমেছে। মেশিন-শ্রমিক অনুপাত কমেছে। কাঁচামাল বিশেষত কাপড় ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া গেছে। ... সার্বিকভাবে পোশাক কারখানায় দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।' বাংলাদেশের উন্নয়ন অধ্যয়ন প্রতিষ্ঠানের (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-বিআইডিএস) গবেষণা থেকে পাওয়া যায়–'প্রতি ১০০ টাকার পোশাক উৎপাদনে কমপক্ষে ৩১ টাকা শ্রমিক তার শ্রমের মাধ্যমে যোগ করে, কিন্তু শ্রমিক পায় মাত্র ৭ টাকা।' মজুরি বাড়লে হয়তো শুধু শ্রমিকের অংশ থেকে সামান্য কম মুনাফা নিতে হবে মালিকদের, এই-তো!

ফলে বর্তমান বাস্তবতায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে জীবনযাত্রার খরচ, শ্রমিক ও তার পরিবারের চাহিদা, উৎপাদনের খরচ, উৎপাদনশীলতা, পণ্যের দাম, নিয়োগকারীদের সক্ষমতা, দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ও মুদ্রাস্ফীতি-মূল্যস্ফীতির হার ইত্যাদি বিবেচনায় সর্বনিম্ন ২৫ হাজার টাকার কম হলে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সেক্ষেত্র বেসিক বা মূল মজুরি দিতে হবে ১৪,০০০ টাকা, বাড়ি ভাড়া ৭,০০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ১৫০০ টাকা, যাতায়াত ভাতা ১৫০০ টাকা, টিফিন ভাতা ১০০০ টাকা।

যদিও ২৫ হাজার টাকা মজুরিও বর্তমান বাজার মূল্যের সাপেক্ষে অপ্রতুল। এই মজুরি দিয়েও সন্তানের জন্য পুষ্টিকর খাবার, লেখাপড়া, সপ্তাহে দুই-এক বেলা বেলা মাছ/মাংস, অসুস্থ মা-বাবার চিকিৎসা, কারও বড় অসুখ হলে চিকিৎসা, ছেলেমেয়ে/ছোট ভাই-বোনদের বিয়ে দেয়া, অতিথি আপ্যায়ন, বিনোদন-মানবিক চাহিদা ইত্যাদি কোনো কিছু করার বাস্তবতাই থাকবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে এই নিম্নতম দাবিটুকু বাস্তবায়ন বিনা আন্দোলনে হয়ে যাবে এই ভরসা করা যায় না। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত যে ৫ বার মজুরি বোর্ড গঠিত হয়েছে এবং নতুন মজুরি নির্ধারিত হয়েছে, প্রতিবার শ্রমিকদের আন্দোলনের মাধ্যমেই হয়েছে। তাই শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ-নীতিনিষ্ঠ আন্দোলনই দাবি আদায় ও মুক্তির পথকে প্রশস্ত করবে।

সাম্যবাদ
১১ বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৩

দূতাবাসে ধর্ণার

শেষ পৃষ্ঠার পর

১৯৭৬ সালে চীন বিপ্লবের রূপকার মাও সে তুংয়ের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। চীন পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে যাত্রা শুরু করে। ২০০৪ সালে চীন আনুষ্ঠানিকভাবে, আইনগতভাবে ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকৃতি দেয় ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে সে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে তার আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার শুরু করে এবং এই এলাকায় ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, মালদ্বীপ– এ সকল দেশে ভারতের সাথে চীনের কর্তৃত্বের প্রতিযোগিতা এ সত্যকেই তুলে ধরে। একইসাথে ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ দেশ বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে চীন ও ভারতের দ্বন্দ্ব যত দিন যাচ্ছে ততই আরও খোলামেলাভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী চীন ও ভারতের মধ্যে দ্বন্দ্বের চরিত্র বিশ্লেষণ শুধুমাত্র তাদের আঞ্চলিক ভূমিকা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এর সাথে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের মেরুকরণ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর আমেরিকা একমেরু বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিশ্বের যে কোন বিষয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথাই তখন শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায়। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়ে যায়– যে দেশের সরকার যখনই আমেরিকার বিরোধীতা করেছে কিংবা তার দেশের বাজার দখল ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুটপাট করতে আমেরিকাকে বাধা দিয়েছে, সেই সরকারকেই ভেতর থেকে সামরিক কিংবা বেসামরিক ক্যু এর মাধ্যমে উৎখাত করা হয়েছে কিংবা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাকে অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা করা হয়েছে। আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স 'সিআইএ' এর ফাঁস হওয়া নথিপত্রেও এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমেরিকার কথাকে অগ্রাহ্য করে সেই দেশকে সহযোগিতা করার সাহস ও ক্ষমতা বিশ্বের কোন দেশেরই ছিল না। ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিও এক্ষেত্রে আমেরিকার সম্পূর্ণ অনুগত। এই বলয়ে আছে জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপের বাইরের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ।

বিশ্বের দেশে দেশে আজ যত ধরনের জাতিগত, সম্প্রদায়গত, বর্ণগত নিপীড়ণ ও বিভাজন চলছে– তার পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমেরিকার হাত আছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আক্রমণের ঝুঁকির কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নিরাপত্তার স্লোগান তুলে 'ন্যাটো' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমেরিকার উদ্যোগে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর সেই ন্যাটো বিলুপ্ত করা হয়নি, বরং একে আরও প্রসারিত করা হচ্ছে। রাশিয়ার একেবারে পাশের দেশ ইউক্রেনকে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যার পরই রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে। ইউক্রেন যুদ্ধের উৎস খুঁজতে গেলেও সেখানে আমেরিকার ভূমিকাই প্রধানভাবে আসবে। শুধু এটি নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যতগুলো আঞ্চলিক ও স্থানীয় যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে আমেরিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল, সকল যুদ্ধেই আমেরিকার পুঁজিপতিরা অস্ত্র বিক্রি করে লাভবান হয়েছে।

রাশিয়া সমাজতন্ত্র ছেড়ে দিয়ে পুঁজিবাদে প্রবেশের পর তারাও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে। চীন ও রাশিয়া– পূর্বের সমাজতান্ত্রিক দুটো দেশ আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সামরিক শক্তি রাখতো। কিন্তু সার্বিকভাবে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতি এখন পাল্টেছে। ধীরে ধীরে তারা আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করার দিকেই যাচ্ছে।

ফলে বিশ্ব আজ একমেরু থেকে দুই মেরুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। একদিকে আমেরিকার নেতৃত্বে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানিসহ ইউরোপের দেশগুলো এবং জাপান, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশ; অন্যদিকে রাশিয়া-চীনের নেতৃত্বে ইরানসহ মধ্য এশিয়ার রাশিয়ার প্রভাবাধীন দেশগুলো। এই মেরুকরণে ভারত আমেরিকার সাথেই মূলতঃ যুক্ত, যদিও আমেরিকার প্রভাবের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা বিভিন্ন অর্থনৈতিক জোটেও সে যুক্ত আছে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চলে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী যেহেতু চীন, আবার বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে আমেরিকারও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীন– তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারতের যুক্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নীতি এবং ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের নীতি এক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সেটা বিগত সময়ে হয়েছেও। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই অঞ্চলের মোড়ল হিসেবে ভারতকে স্বীকৃতিও দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন আগে থেকেই এই নীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে আমেরিকা সরাসরি বাংলাদেশের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে থাকে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এটি আরও বৃদ্ধি পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র র‍্যাব ও র‍্যাবের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার উপর স্যাংশন জারি করা, ভিসা নীতি ও নির্বাচন, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে খোলামেলা মত প্রকাশ করা– এসকল ঘটনা সরকারের সাজানো নির্বাচনের পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করেছে। অথচ ভারতের অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ভিন্ন। ২০১৪ সালের মতো নগ্নভাবে আওয়ামী লীগকে সমর্থন না করলেও তারা মোটাদাগে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকুক এটা চাইছেন– এখনও পর্যন্ত তাদের প্রকাশ্য ভূমিকা থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া, চীন ও ইরান। তারা বলছেন, কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ফলে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অবস্থান বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অবস্থিত পরিস্থিতি এবং ভারসাম্যের উপরও নির্ভরশীল।

ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী দুই শিবির প্রায় মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়ে। আবার এদিকে দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকার মুখোমুখি, সংগঠিত না হলেও জনগণ প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের উপর– এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবেলা করতে গিয়ে রাশিয়া-চীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে তুলনামূলক বেশি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আচরণকে প্রশমিত করার জন্য বিভিন্ন অন্যায্য সুবিধা সে প্রতিনিয়ই দিচ্ছে। ভারত তো এদেশের জন্মলগ্ন থেকেই তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। তাকে সকল রকম সুবিধা সকল সরকারের আমলেই দেয়া হয়েছে। শুধু বাণিজ্য নয়, বাস্তবে এদেশের প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ ধ্বংস করেই ভারতীয় শিল্পপতিদের ব্যবসা বড় হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের এই ত্রিমুখী ভূমিকা তাদের নিজের স্বার্থকে কেন্দ্র করে– সেটা বোঝাই যায়। সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন শক্তির সাথে দর কষাকষির মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অস্বাভাবিক হলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে খোলামেলা হস্তক্ষেপ, অস্বাভাবিক হলো প্রধান প্রধান সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর দূতাবাসগুলোতে গিয়ে ধর্ণা দেয়া। এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে দেশে আনুষ্ঠানিক যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সেটাও না থাকার কারণে। আওয়ামী লীগ আবারও একটি একতরফা নির্বাচন করতে চায়। বহির্বিশ্বে যারা নির্বাচন, মানবাধিকার– এসবের সার্টিফিকেট দেন, সেই সার্টিফিকেট কেনার জন্য তাকে তাই প্রচুর মূল্য দিতে হচ্ছে। আবার তাদের সাথে যদি সম্পর্ক বেশি খারাপ হয়, তাহলে যে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হবে সেটা মোকাবেলার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেও হাতে রাখতে হচ্ছে– অর্থাৎ দেশের সমস্ত সম্পদ নিঃশর্তভাবে তুলে দিয়েও ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত করতে হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে ক্ষমতায় আসা সকল সরকারই একাজ করেছে।

তাহলে নির্বাচিত সরকার থাকলেই কি বাংলাদেশ সরকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর এই প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারতো? সেটাও সম্ভব নয়। কারণ দেশের সরকারের যে আচরণ সেটা দেশের মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ কতটুকু ঘটেছে এবং তার রূপ কী– এর সাথে যুক্ত। বাংলাদেশে পুঁজিবাদ এতখানি শক্তিশালী হয়ে উঠেনি যে সে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথে একটা বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি দেখলেও সেটা বোঝা যায়। এখানে ভারী শিল্প কারখানা বা মৌলিক শিল্প গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেনি। সবচেয়ে বড় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প গার্মেন্টস খাতের কাঁচামাল কিংবা বাজার কোনটাই এদেশের নয়। শিল্পের এই অসম বিকাশ পুঁজিবাদের ক্ষয়ের **৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়**

উন্নত নৈতিকতার ভিত্তিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধীনে হওয়া দরকার, যদি সংসদের সম্মতি থাকে। কিন্তু সে রায়কে আওয়ামী লীগ গ্রাহ্য করেনি। ফলে পঞ্চদশ সংশোধনী সংবিধানসম্মত হয়েছে কিনা সেটাই একটা প্রশ্ন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

নির্বাচনের কথা, গণতন্ত্রের কথা বললে আমাদেরকে বলা হয় যে, দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। আমরা গণতন্ত্র নিয়ে এত চিন্তিত কেন? উন্নয়ন কী হয়েছে সেটা আপনাদের ব্যাখ্যা করে বলার কিছু নেই। আপনারা জীবন দিয়ে সেটা বুঝতে পারছেন। দেশে মানুষের কাজ নেই, ভূমিহীন-গৃহহীন বাড়ছে, না খেয়ে থাকা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এর মধ্যেও যারা কাজ করেন, তারা দিন আনেন, দিন খান। পরের দিনের কাজের নিশ্চয়তা নেই, খাবারের নিশ্চয়তা নেই। একটা বিশাল সংখ্যক মানুষের এই অবস্থা। অন্যদিকে আমরা দেখছি দেশে কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে, অতি ধনী বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষ। সুইস ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি জমা আছে এমন বাংলাদেশীর সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে।

ফলে বাংলাদেশ আজ দুইভাগে বিভক্ত। একদিকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত, সর্বশান্ত মানুষ; অন্যদিকে অল্পকিছু বিত্তবান লোক। আওয়ামী লীগ সরকার এই অল্পসংখ্যক বিত্তবান লোকেদের স্বার্থই রক্ষা করছে। তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। অর্থনৈতিক শোষণ ও লুটপাটে বিপর্যস্ত মানুষ যাতে কোন প্রতিবাদ করতে না পারে সেজন্য দমনমূলক আইন প্রনয়ণ করা হচ্ছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে গ্রেফতার হয়ে লেখক মোশতাকের জেলে মৃত্যুর ঘটনা আপনারা জানেন। এই আইনের মাধ্যমে বিরোধী মতকে দমন করা হচ্ছে। তুমুল সমালোচনার মুখে পড়ে এই আইনের নাম পাল্টে 'সাইবার নিরাপত্তা আইন' নামে বহাল রাখা হয়েছে। সমস্ত মতকে দমন করে একটা ফ্যাসিবাদী শাসন দেশে কায়েম করা হয়েছে। ফ্যাসিবাদ মানুষের যুক্তি করার ক্ষমতাকে নষ্ট করে। বিজ্ঞানের কারিগরি দিকের সাথে আধ্যাত্মবাদের মিশ্রণ ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদ একটা যুক্তিহীন অন্ধ মনন তৈরি করে। আমরা যখন ফ্যাসিবাদী শাসন বলছি তখন মনে রাখতে হবে, ফ্যাসিবাদ কোন দল আনে না। ফ্যাসিবাদ একটা ব্যবস্থা আনে। এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকার জন্য ফ্যাসিবাদ নিয়ে এসেছে। এই পুঁজিবাদ একদিন সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার কথা বলেছিল। আজ সে ক্ষয়িষ্ণু। এই ক্ষয়িষ্ণু, অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, সে যদি এই পুঁজিপতিদের স্বার্থে দেশ পরিচালনা করে তাহলে ফ্যাসিবাদ কায়েম করা ছাড়া তার অন্য কোন উপায় নেই। ফ্যাসিবাদ ছাড়া পুঁজিবাদ আজ টিকে থাকতে পারবে না। পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে হউক, একদলীয় শাসন হউক, দ্বিদলীয় শাসন হউক, মিলিটারি শাসন হউক– যে ফর্মেই রাষ্ট্র চলুক না কেন, ফ্যাসিবাদ তাকে কায়েম করতেই হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে উন্নত-অনুন্নত সকল দেশেই ফ্যাসিবাদ একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই ফ্যাসিবাদকে উচ্ছেদ করতে হলে এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে হবে। ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই যে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের লড়াই– এই সত্য মানুষকে বুঝতে হবে। এটা যতদিন না তারা না বুঝবে, ততদিন একদলের শাসনে বিক্ষুব্ধ হয়ে আরেক দলকে ক্ষমতায় আনবে। মুক্তি আসবে না।

একইসাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশের বুর্জোয়া দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়া ও টিকে থাকার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কাছে ধর্ণা দিচ্ছেন। কখনও মার্কিন, কখনও ভারতীয়, কখনও রুশ, কখনও চীনা সাম্রাজ্যবাদের কাছে যাচ্ছেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কখনও মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদ চায় বাজারের দখল। এজন্য সে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করেছে। যুদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের টিকে থাকার আর কোন উপায় নেই। তাই সে দেশে দেশে যুদ্ধ বাধাচ্ছে, সম্পদ লুট করছে। সাম্রাজ্যবাদ কখনও গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে পারেনা। তাদের কাছে ধর্ণা দিয়ে এদেশে মুক্তির লড়াই দাঁড়াতে পারে না। মুক্তির লড়াই গড়ে উঠতে পারে একমাত্র বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ধারাকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই এদেশে সমস্ত শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার লড়াই গড়ে উঠতে পারে। চূড়ান্ত মুক্তি অর্জিত হবে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। যদি আজ গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোও রক্ষা করতে চাই, তবে বামপন্থাকে শক্তিশালী করা ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

বামপন্থী শক্তিকে এজন্য একটা উন্নত নৈতিকতার ভিত্তিতে গণআন্দোলনের জোয়ার তৈরি করতে হবে। যে জোয়ার এদেশের মানুষ দেখেছিলো মুক্তিযুদ্ধে, সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে। সেই জোয়ার তৈরি করতে হবে। বুর্জোয়া দলগুলো এদেশের যুবক-তরুণদের ভাড়াটিয়া গুন্ডা বাহিনীতে পরিণত করেছে। মাদকের বিস্তার, জুয়ার বিস্তার, পর্নোগ্রাফির বিস্তার ঘটিয়েছে। এর বিরুদ্ধে নৈতিক জাগরণ ঘটাতে হবে, আদর্শের ভিত্তিতে লড়াই গড়ে তুলতে হবে। বামপন্থীদের এই জাগরণ ঘটাতে হবে। আসুন আমরা সেই লড়াই গড়ে তুলি। এ ছাড়া আমাদের মর্যাদা নিয়ে বাঁচবার অন্য কোন পথ নেই।

'জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২১'

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

ক্লাসের বাইরে ছিল (৭ ডিসেম্বর ২০২১, বণিক বার্তা)। আর দ্রব্যমূল্যের এই ভয়ানক ঊর্ধ্বগতির সময়ে গ্রাম-শহরের অভিভাবকরা কিভাবে ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং ব্যবহারিক ক্লাসের উপকরণের খরচ বহন করবেন? বিভাগ বিভাজন তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং যুক্তিপূর্ণ মানসিকতা গড়ে ওঠার পথ বিঘ্নিত হবে।

সমাবেশ থেকে বক্তারা অবিলম্বে সর্বনাশা এই শিক্ষাক্রম বাতিল করে নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র সংগঠনসহ অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেকুলার, গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের দাবি জানান।

‘জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২১’ বাতিলের দাবিতে ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে

ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমাবেশ

চলমান ফ্যাসিবাদী শাসনের পরিপূরক মনন গড়ে তুলতেই নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে

গত ১৬ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম -২০২১ বাতিলের দাবিতে শাহবাগে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগঠনের সভাপতি সালমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, স্কুল শিক্ষক শামীম জামান, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সহ সভাপতি মানস নন্দী, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ঢাকা নগর ইনচার্জ সুস্মিতা রায় সুপ্তি প্রমুখ। সমাবেশে সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদ।

সভায় বক্তারা বলেন, সরকার গত ১৫ বছর ধরে গায়ের জোরে ক্ষমতায় আছে। একদিকে তারা দমন-পীড়ন, স্বাধীন মতামত দমন করার জন্য সাইবার নিরাপত্তা আইন, পুলিশ-রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে বিরোধী যে কোনো ধরণের মত দমন করছে আরেকদিকে ফ্যাসিবাদী মনন কাঠামো গড়ে তোলার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম চালু করছে। এই শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে তারা এমন এক শ্রেণীর মানুষ তৈরি করতে চায় যারা এই রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করবে না। শুধু তাই নয় এই শিক্ষাক্রম শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য, বাণিজ্যীকিকরণ-বেসরকারীকরণকে আরো তরান্বিত করবে। অভিভাবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলোর যখন এই শিক্ষাক্রম বাতিলের দাবীতে কথা বলছে, আন্দোলন করছে তখন শিক্ষামন্ত্রী তাদের মতামতের কোনো গুরুত্ব না দিয়ে আন্দোলন সম্পর্কে যে অসত্য এবং বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করলেন তা অগণতান্ত্রিক আচরণেরই পরিচয়ক।

বক্তারা আরো বলেন, নতুন মূল্যায়নে শিক্ষক সহ অংশীজনদের থাকার কথা। এই মূল্যায়ন সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ বলেন, এই অংশীজন কারা হবেন সেটা যেমন স্পষ্ট নয় অন্যদিকে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা জানি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। নির্দ্বিধায় বলা যায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অংশীজনদের অংশগ্রহণ স্বজনপ্রীতি এবং দূর্নীতি বাড়াবে। করোনাকালে এবং তার পরবর্তী সময় স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের আচরণেও অনেক ক্ষতিকর পরিবর্তন এসেছে। এসব নিয়ে আমরা তো বটেই, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদসহ সচেতন মহল উদ্বিগ্ন। অন্যদিকে ব্যানবেইসের তথ্য মতে করোনাকালে গ্রামের ৯৪% শিক্ষার্থী অনলাইন ৩য় পৃষ্ঠায়

ভোটাধিকার, বেকারত্ব নিরসন ও যুবসমাজের অধিকার আদায়ে

বিপ্লবী ধারার যুব সংগঠন ‘বাংলাদেশ যুব ফ্রন্ট’-এর আত্মপ্রকাশ

ভোটাধিকার, বেকারত্ব নিরসন ও যুবসমাজের অধিকার আদায়ে উন্নত নৈতিকতা ও আদর্শের ভিত্তিতে যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে বিপ্লবী ধারার যুব সংগঠন হিসেবে ‘বাংলাদেশ যুব ফ্রন্ট’ আত্মপ্রকাশ করেছে। গত ১৪ অক্টোবর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনী মিলনাতয়নে এক সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এ সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। সংগঠনের সদস্য প্রেমানন্দ দাশের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রাশেদ শাহরিয়ার।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, “যেকোন দেশের যুবসমাজ দেশের সম্পদ। এদেশের ইতিহাসেও আমরা দেখি, দেশের যে কোনো সংকটকালে ছাত্র-যুবসমাজই সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছে। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাই যুবসমাজের প্রতিরোধের শক্তিকে নষ্ট করতে দেশে মাদক, জুয়া ও পর্নোগ্রাফির ব্যাপক প্রসার ঘটছে। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সূর্য সন্তান মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা, ভগৎ সিং ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদ রুমি, আজাদ, আসাদের মত আদর্শ যুবচরিত্রের সাধনা সমাজে অনুপস্থিত। তাই রুচি, মূল্যবোধহীন তরুণ প্রজন্ম ক্ষমতার নোংরা রাজনীতির চাপে দিকভ্রান্ত ও হতাশায় নিমজ্জিত।

এমতাবস্থায় আমরা মনে করি বর্তমানে যুবসমাজের বেকারত্ব ও সাংস্কৃতিক সংকট নিরসনের জন্য এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি যুব আন্দোলন আজ সময়ের দাবি। দেশের যুবসমাজের এই অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট নিরসনে এদেশে উন্নত নৈতিকতা ও আদর্শের ভিত্তিতে যুব আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি বিপ্লবী ধারার লড়াকু যুবসংগঠন হিসেবে আমরা ‘বাংলাদেশ যুব ফ্রন্ট’-এর সূচনা করছি।”

সংবাদ সম্মেলন থেকে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকার পদত্যাগ, নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নিবার্চন, সরকারি উদ্যোগে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকার ভাতা চালু, চাকুরির আবেদন ফি বাতিল, চাকুরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধি, চাকুরির পরীক্ষাসমূহ বিভাগীয় পর্যায়ে নেওয়া, ঘুষ- দুর্নীতি বন্ধ, সরকারি শূন্যপদসমূহে নিয়োগ, মাদক, জুয়া, পর্নোগ্রাফি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলন শেষে রাশেদ শাহরিয়ারকে আহ্বায়ক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি ঘোষণা করেন বাসদ (মার্কসবাদী)-এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য ডাঃ জয়দীপ ভট্টাচার্য। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- মোহাম্মদ আশরাফ, রেজাউর রহমান রানা, প্রেমানন্দ দাশ, সাব্বির আহমেদ, জুয়েল আহমেদ, ফাল্গুনী বিশ্বাস, হাসিব মামুন, দীপন মজুমদার, সায়েদুর রহমান লিংকন, অসীম তুহিন, প্রাচুর্য কান্তি প্রাজ্ঞ, মাজেদুল ইসলাম, সানজিদা তারিন, সাফায়েত সাগর, এ. এম. লিটন, বিকাশ দাস, মিজানুর রহমান, জুয়েল মিয়া।

ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার কমিটি গঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার একাদশ কমিটির পরিচিত সভা ও র‍্যালী গত ৩রা নভেম্বর’২৩ বিকেল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত কমিটি পরিচিতি সভার পূর্বে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী নগরীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট প্রদক্ষিণ করে আবার শহীদ মিনারে এসে আলোচনা সভায় মিলিত হয়। সংগঠনের নগর শাখার সভাপতি সঞ্জয় কান্ত দাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাদিয়া নোশিন তাসনিমের পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন, বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলার আহবায়ক কমরেড উজ্জ্বল রায়, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ছাত্রনেতা সালমান সিদ্দিকী, একাদশ কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক সুমিত কান্তি দাস পিনাক, সদস্য সচিব বুশরা সুহাইল ও চা বাগান শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের সংগঠক অধির বাউরী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, “ হাজার বছর ধরে গড়ে উঠা জ্ঞানভান্ডার যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় সেই শিক্ষার অধিকার থেকে জনগণকে আজ শাসক গোষ্ঠি বঞ্চিত করছে। 'টাকা যার শিক্ষা তার' কিংবা আসন সংকোচন এরকম নিত্যনতুন নীতির মধ্য দিয়ে একদিকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে অন্যদিকে নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্বহীন একটা প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাইছে। ফলে আজকের দিনে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট শিক্ষা, নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব রক্ষার লড়াই যেমন একদিকে করছে তার সাথে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রাম করছে।

সভার শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি সালমান সিদ্দিকী সঞ্জয় কান্ত দাসকে সভাপতি, সুমিত কান্তি দাস পিনাককে সহ-সভাপতি ও বুশরা সোহেলকে সাধারণ সম্পাদক করে নবগঠিত ৯ সদস্য বিশিষ্ট নগর কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন।

সাম্যবাদ
১১ বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৩

গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের ১ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ২৫ হাজার টাকা ঘোষণা, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন, অত্যাবশ্যক পরিষেবা বিল বাতিল, নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন, ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ শুক্রবার বিকাল ৩টায় ঢাকার আশুলিয়া প্রেসক্লাব মিলনায়তনে 'গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন'-এর ১ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.ক.ম. জহিরুল ইসলাম। উদ্বোধনের পর বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্লেকার্ড-ফেস্টুনে সজ্জিত একটি মিছিল আশুলিয়ার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে আশুলিয়া প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাসুদ রেজার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদের সঞ্চালনায় সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন 'বাসদ (মার্কসবাদী)'-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা, লেখক ও গবেষক মাহা মীর্জা, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব জাহেদুন নবী কনক।

উচ্চশিক্ষার বেসরকারীকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ-সংকোচন ও

ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার দাবি

উচ্চশিক্ষার বেসরকারীকরণ- বাণিজ্যিকীকরণ-সংকোচন ও ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার দাবিতে গত ২ অক্টোবর, ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ মিলনায়তনে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কনভেনশন-২০২৩' অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। আলোচনা করেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তানজিম উদ্দিন খান ও মোশাহিদা সুলতানা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আমিরুল ইসলাম কনক ও আ আল মামুন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর রাজী, কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হোসেন, শিক্ষক ও গবেষক মাহা মির্জা এবং 'বাসদ (মার্কসবাদী)' এর সমন্বয়ক মাসুদ রানা।

কনভেনশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

মেট্রোরেল

৪ দফা দাবি

- ভাড়া সর্বনিম্ন ১০ ও সর্বোচ্চ ৫০ টাকা
- শিক্ষার্থী-শ্রমিকদের জন্য হাফভাড়া
- নিয়মিত যাত্রীদের মাসিক কার্ডে বিশেষ কনসেশন
- মেট্রোস্টেশনে টয়লেট ব্যবহারের উচ্চ ফি বাতিল

'নাগরিক আন্দোলন'-এর মানববন্ধন

মেট্রোরেলের ভাড়া কমিয়ে সর্বনিম্ন ভাড়া ১০টাকা ও সর্বোচ্চ ভাড়া ৫০ টাকা পুনঃনির্ধারণ, শিক্ষার্থী-শ্রমজীবী-ন্যূনতম আয় শ্রেণির মানুষের জন্য হাফ ভাড়া, নিয়মিত যাত্রীদের মাসিক কার্ডে বিশেষ কনসেশন প্রদান, মেট্রোরেলের পরিচালনা পরিষদে যাত্রী প্রতিনিধিত্ব ও মেট্রোস্টেশনে টয়লেট ব্যবহারের উচ্চ ফি বাতিলের দাবিতে এক মানববন্ধন কর্মসূচি ৩ নভেম্বর শুক্রবার বিকাল ৪.৩০টায়, মিরপুর ১০নং মেট্রোস্টেশনসংলগ্ন ফায়ার সার্ভিসের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। 'নাগরিক অধিকার আন্দোলন', মিরপুর-এর উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন 'নাগরিক অধিকার আন্দোলন', মীরপুর-এর সংগঠক গল্পকার মাহমুদুল হক আরিফ ও পরিচালনা করেন শিক্ষক শামীম জামান। এতে বক্তব্য রাখেন সমাজকর্মী ড. সৈয়দ তারিকুজ্জামান, সংস্কৃতিকর্মী শামীমা দিশা, ডা. মুজিবুল হক আরজু, শ্রমিকনেত্রী শবনম হাফিজ, বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা রাশেদ শাহরিয়ার,, সিপিবি নেতা ডা. সাজেদুল হক রুবেল, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ নেতা শামীম ইমাম, দুয়ারীপাড়ার কাঠমিস্ত্রী শহীদুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম কিরণ প্রমুখ।

মানববন্ধন সমাবেশে বক্তারা বলেন – "যানজটের শহর ঢাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত মেট্রোরেলের দ্রুতগতির, নিরাপদ ও আরামদায়ক পরিবহনসেবা পাওয়ার অধিকার ঢাকার সর্বস্তরের জনগণের। কারণ, মেট্রোরেল নির্মাণে সরকারের ৩৩ হাজার কোটি টাকার বেশি যে ব্যয় হয়েছে, তা দেশের সব মানুষের দেয়া ট্যাক্সের টাকা থেকেই আসবে। অথচ মেট্রোরেলে যে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে তা জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শ্রমজীবী-গরীব-নিম্নবিত্ত মানুষ, এমনকি মধ্যবিত্তের অনেকের সাধ্যের বেশি। এই বাড়তি ভাড়া নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষদের জন্য নতুন ধরনের বৈষম্য তৈরি করবে। উত্তরা-মতিঝিল ২০ কি.মি. পথে মেট্রোরেলের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ টাকা ও ১০০ টাকা। এই ভাড়া রাজধানীর বেসরকারি বাস ভাড়ার দ্বিগুণ এবং ভারত ও পাকিস্তানের মেট্রোরেলের ভাড়ার চেয়ে ২ থেকে ৫ গুণ বেশি। প্রশ্ন ওঠে – মেট্রোরেল **৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়**

কমরেড মানিক মুখার্জী লাল সালাম

গত ১৬ অক্টোবর রাতে ভারতের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পার্টির প্রবীণ পলিটব্যুরো সদস্য, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড মানিক মুখার্জী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাসদ (মার্কসবাদী) দলের পক্ষ থেকে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি। দলের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের নিকট একটি শোকবার্তা প্রেরণ করেছেন। কমরেড মানিক মুখার্জীর মৃত্যুতে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন এক সংগ্রামী যোদ্ধাকে হারালো।

নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা প্রায় উধাও হয়ে যাচ্ছে। তার পরিবর্তে বড় বড় কর্পোরেট গ্রুপগুলোর আধিপত্য তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বিবিসি বাংলা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেখানে এই বড় পুঁজিপতিদের একচেটিয়া ব্যবসার এক ভয়ঙ্কর চিত্র উঠে এসেছে। পণ্য আমদানি থেকে খুচরা বাজারে বিক্রি পর্যন্ত– প্রায় সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে। তাদের দৌরাত্ম্যে মাঝারি ও ক্ষুদ্র আমদানিকারকেরা বাজার থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এমনকি তুলনামূলক বড় পুঁজি নিয়ে কেউ বাজারে ঢুকতে চাইলেও তা পারবেন না– তাদের অনুমতি ছাড়া। জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের জন্য লাইটার জাহাজ, কাস্টমস্– সবকিছু তারা নিয়ন্ত্রণ করেন। নতুন আমদানিকারক ব্যাংকে এলসি খুলতে পারবেন না– কারণ ব্যাংকগুলোর মালিক তারাই, কিংবা তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান। সেটা পারলেও, আমদানি করলেও মাল খালাস করতে পারবেন না, কারণ মাল খালাসের লাইটার জাহাজের কোম্পানিগুলোও তাদের। এত বাধা ডিঙ্গিয়ে মাল খালাস করলেও কাস্টমস্ ও কর বিভাগের ছাড়পত্র তারা পাবেন না, কারণ সেটাও কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণে। তারপরও কারও পণ্য যদি বাজারে পৌঁছে তখন সিন্ডিকেটের অন্যান্যরা তার চেয়ে কম দামে একই পণ্য বাজারে ছেড়ে তাকে লোকসানে ফেলে দেবেন।

সরকারকে এই বড় ব্যবসায়ীরাই ক্ষমতায় বসিয়ে রেখেছেন। বসুন্ধরা, স্কয়ার, আকিজ, সিটি, এস আলম, মেঘনা– এই বড় বড় কর্পোরেট গ্রুপগুলো এখন খাদ্যের বাজারের সাথে জড়িত। এরা সকলেই আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ। আওয়ামী লীগের দলীয় তহবিল তারাই পূর্ণ করেন। আওয়ামী লীগ সরকার এই বড় বড় শিল্পপতিদের ম্যানেজার মাত্র। এই লুটের ভাগ নিয়েই তাদের দল চলে, নেতাদের কোটি কোটি টাকা উপার্জন হয়। অসহায়ত্বের কথা যখন মন্ত্রীরা বলেন, তখন অসহায়ত্বের কারণও ঠিকঠাক বলা উচিত।

মন্ত্রীরা যুক্তি দেখান, ব্যবস্থা নিলে বড় ব্যবসায়ীরা আমদানি বন্ধ করে দেবে। সেক্ষেত্রে দেশে খাদ্য সংকট তৈরি হবে। এটা একটা মিথ্যা কথা। এই ব্যবসায়ীরা খাদ্যপণ্য আমদানি করতে পারবেন কি না, সেটাও নির্ধারণ করে সরকার। সরকারের ক্ষমতা অসীম। কিন্তু তারা যে কোন ভূমিকা রাখছেন না, তার কারণ সরকার আর এই ব্যবসায়ীরা এক ও অভিন্ন।

তাছাড়া, খাদ্যপণ্যের ব্যবসা যেই করুক, যেহেতু কোন ব্যবসায়ীই দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মহান ব্রত নিয়ে ব্যবসা করেন না, করেন সর্বোচ্চ লাভের জন্য। ফলে যাদের হাতেই এ ব্যবসা যাক– সিন্ডিকেট, কার্টেল, দাম বাড়ানো এগুলো চলতেই থাকবে।

তাহলে উপায় কী? এর একমাত্র উপায় হচ্ছে ব্যবসায়ীদের উপর খাদ্যপণ্য আমদানির ভার না দিয়ে সেটা 'ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ' বা 'টিসিবি' -এর মাধ্যমে সরকারকে নিজেই আমদানি করতে হবে। বাইরে থেকে আমদানি করা ও দেশে উৎপাদিত– সকল খাদ্যপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে। কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য কিনবে রাষ্ট্র, মজুত করবে রাষ্ট্র, প্রক্রিয়াজাতকরণ হবে রাষ্ট্রের মাধ্যমে– খাদ্যপণ্যের বাজার ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দেয়া যাবে না। এ ছাড়া খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যাবে না।

বামপন্থী দলগুলো এ দাবি অনেকদিন থেকেই করে আসছে। শুধু আমদানি, মিল ও পাইকারি ব্যবসা নয়, খাদ্যপণ্যের খুচরা ব্যবসা পর্যন্ত সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তা না হলে বড় বড় ব্যবসায়ীরা সেই বাজারও একচ্ছত্র দখল করবেন। এই কাজ করতে পারে বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সুবিধা না নেয়া গণতান্ত্রিক শক্তি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূল্যবৃদ্ধি হবেই। তা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থায় বাজারকে যতখানি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেটা একমাত্র বামপন্থীরাই করতে পারে।

আওয়ামী লীগ সরকার

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

জনগণ যাকে নির্বাচিত করবে– সেই ক্ষমতায় আসবে। এই আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দেশে চালু থাকা দরকার। আজ দেশে দেশে বুর্জোয়া দলগুলোর নেতৃত্বে গঠিত সরকারগুলো, তারা একসময় যে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তার কোনটারই অস্তিত্ব রাখছেনা। বামপন্থীরা এই গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য লড়াই করে। কিন্তু সাথে সাথে আমরা এও বলতে চাই যে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আসা সরকার জনগণের সমস্যার কোন সমাধান করবে না। করতে পারবে না। কারণ যে বৃহৎ ব্যবসায়ীরা বাস্তবে সরকার চালায়, যে সিন্ডিকেট বাস্তবে সকল সিদ্ধান্ত নেয়– তারা একই থাকবে, পোশাক পরিবর্তন করবে মাত্র। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই পরিবর্তন করতে হবে। এজন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাম গণতান্ত্রিক জোটকে শক্তিশালী করা দরকার।

দেশের এই পরিস্থিতিতে, সার্বিক ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা নিম্নোক্ত দাবিগুলো উত্থাপন করছি:

১. অবিলম্বে সরকারকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে নির্দলীয় তদারকি সরকারের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে।

২. পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর যে সকল সদস্যকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে আন্দোলন দমনের জন্য রাস্তায় নামানো হয়েছে, তাদেরকে প্রত্যাহার করতে হবে। জেলে মিথ্যা মামলায় আটক সকল বিরোধী নেতাকর্মীদের মুক্তি দিতে হবে, তাদের উপর দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

২. শ্রমিকদের উপর সকল দমন-পীড়ন বন্ধ করতে হবে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরির ন্যায্য দাবি মেনে নিতে হবে। শিল্প এলাকা থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করতে হবে। নিহত শ্রমিক পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং শ্রমিক হত্যার বিচার করতে হবে।

৩. সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। নিম্নবিত্ত-খেটে খাওয়া-শ্রমজীবী মানুষের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই দাবিগুলো অগ্রাহ্য করে যদি আওয়ামী লীগ সরকার আরেকটি সাজানো নির্বাচনের দিকে যান, তবে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। দমন-নির্যাতন-নিপীড়ণ করে কেউ-ই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেননি, আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রেও সেই ঐতিহাসিক সত্যের ব্যতিক্রম ঘটবে না।

দূতাবাসে ধর্ণার

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

যুগে জন্ম নেয়া প্রায় সকল পুঁজিবাদী দেশেরই বৈশিষ্ট্য। ফলে তাকে সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারসাম্য রেখে, বোঝাপড়া করেই চলতে হয়। এ ভিন্ন তার কোন উপায় নেই। কিন্তু এ থেকে এ কথা ধরে নিলে ভুল হবে যে, এদেশ সাম্রাজ্যবাদের আঙ্গুলের নির্দেশে চলে। সে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বন্দ্বগুলোকে কাজে লাগতে পারে, সেখান থেকে সে সুবিধা নিতে পারে। এতটুকু স্বাধীনতা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন দেশ হিসেবে তার আছে।

এদেশের বড় বড় কর্পোরেট হাউজ আওয়ামী লীগকে একচ্ছত্র ক্ষমতায় রেখে বিরাট পুঁজির মালিক হয়েছে। এখনও বড় ধরনের গণঅভ্যুত্থান না ঘটলে তাকেই তারা ক্ষমতায় রাখতে চায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সাথে বোঝাপড়া করেই একাজ তাকে সম্পন্ন করতে হবে– যেমনটি ২০১৪ ও ২০১৮ সালে ঘটেছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতায় কে আসবে তার সিদ্ধান্ত এখন আর জনগণের হাতে নেই– দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে। এই সকল হিসাব-নিকাশ উল্টে দিতে পারে একমাত্র জনগণের অভ্যুত্থান। কিন্তু জনগণের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যদি আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জামায়াত-জাতীয় পার্টির মতো আরেকটি বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা ও উপস্থিতি একইরকম থাকবে। দেশের জনগণ ইতিমধ্যেই দেখেছেন, এই দলগুলোর কেউই দেশের জাতীয় সম্পদ আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনা সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলে দেয়ার প্রতিবাদ করে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বিভিন্ন অন্যায্য হস্তক্ষেপেও তারা নীরব।

একমাত্র বামপন্থীরাই ধারাবাহিকভাবে এর প্রতিবাদ করে এসেছে, লড়াই করেছে, লড়াইয়ে বিজয় অর্জনও করেছে। বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে মার্কিন কোম্পানি শেভরনের মাধ্যমে ভারতে রপ্তানী করা, চট্টগ্রাম বন্দরকে মার্কিন এসএসএ কোম্পানিকে লিজ দেয়া– এগুলো আন্দোলনের মাধ্যমে বামপন্থীরা ঠেকিয়েছে। ফুলবাড়ি কয়লাক্ষেত্র থেকে এশিয়া এনার্জিকে রক্তের বিনিময়ে সরানো হয়েছে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের লড়াইও বামপন্থীরাই লড়েছে। টিপাই মুখে বাঁধ নির্মাণ করে সুরমা-কুশিয়ারার পানি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের নদীগুলোর পানি প্রত্যাহারের চক্রান্তের প্রতিবাদে, তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে, রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রতিবাদে বামপন্থীরাই সরব ছিল। বামপন্থী ছাড়া বাকি সকল দলের ভারত বিরোধীতা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে ভোটের বাণ্ড ভর্তি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ফলে দেশকে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য থেকে মুক্ত রাখতে হলে বামপন্থীদের শক্তিশালী করতে হবে। বামপন্থীদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে। এছাড়া একটা দেশের জাতীয় অর্থে সামর্থ্য অর্জনের প্রশ্ন সেটাও সম্ভব হবে না।

নাগরিক আন্দোলন

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

কি তবে শুধু আর্থিকভাবে স্বচ্ছলদের জন্য? এই ট্রেন কি জনকল্যাণে করা হয়েছে, না কি মুনাফা করা এর উদ্দেশ্য? বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রেলসহ গণপরিবহন সরকার ভর্তুকি দিয়ে চালায়। অথচ আমাদের দেশে পরিচালন ব্যয় তোলার বাইরেও মেট্রোরেল নির্মাণে নেওয়া ঋণের কিস্তি শোধ করার জন্য এবং বেসরকারি বাসমালিকদের স্বার্থে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোরেলের কিলোমিটারপ্রতি নির্মাণব্যয়ও সাম্প্রতিককালে নির্মিত জার্কাতা ও লাহোর মেট্রোরেলে ব্যয়ের দ্বিগুণেরও বেশি।"

তারা আরও বলেন, "বেশি ভাড়ার কারণে শ্রমজীবী মানুষ তো দূরের কথা, এমনকি নিম্ন আয়ের অফিসযাত্রীদের পক্ষেও নিয়মিত মেট্রো ব্যবহার কঠিন হয়ে যাবে। কাজেই মেট্রোরেল যেন শুধু সামর্থ্যবান শ্রেণির মানুষের বাহনে পরিণত না হয় এবং সর্বস্তরের মানুষের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যানজট নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার রাখতে পারে, সে জন্য বাংলাদেশের মানুষের আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে এবং প্রতিবেশী দেশের নগরীগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মেট্রোরেলের ভাড়া হ্রাস করা প্রয়োজন। ৪ দফা দাবিতে 'নাগরিক আন্দোলন' আগামীতে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি প্রদান, মতবিনিময়, যাত্রীসাধারণকে সংগঠিত করাসহ ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করবে।"

নিম্নতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করার দাবিতে শ্রমিক ফেডারেশনের বিক্ষোভ

গত ৭ নভেম্বর ২০২৩ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে গার্মেন্টস শ্রমিক হত্যার বিচার, গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা ঘোষণা, হত্যার শিকার শ্রমিকদের পরিবারকে এক জীবনের আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ, আহতদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের ওপর হয়রানি-ছাঁটাই-নির্যাতন বন্ধের দাবিতে কেন্দ্রীয়ভাবে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বামজোটের সংবাদ সম্মেলনে নেতারা
একতরফা নির্বাচনের চেষ্টা করলে পরিণতি হবে ভয়াবহ

গত ৮ নভেম্বর ২০২৩, বুধবার, বেলা সাড়ে ১১ টায় পুরনো পল্টনের মুক্তিভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাম গণতান্ত্রিক জোট এর সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ। উপস্থিত ছিলেন সিপিবির সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাসদ (মার্কসবাদী)-এর সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির শহীদুল ইসলাম সবুজ ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি ঘোষণা করে বলা হয়, একতরফা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলে ঐ দিনই বাম জোটের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে। একই সাথে পর দিন থেকে হরতাল-অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি পালনের জন্য জোটের নেতাকর্মী ও সর্বস্তরের গণতন্ত্রকামী জনগণকে প্রস্তুত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সভায় আগামী ১০ নভেম্বর থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত দেশব্যাপী বাম জোটের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়।

সাম্যবাদ
১১ বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৩

গাজার ধ্বংসস্তুপ আজ

শেষ পৃষ্ঠার পর

ধ্বংস করে তাদের তাড়িয়ে দেয়। ইহুদিরা এরপর মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুণ্যভূমিতে ফিরে আসার ভাবনা তাদের অনেকের মধ্যে থেকে যায়। ১৮৯৭ সালে অস্ট্রিয়ান ইহুদি থিওডর হার্জেলের উদ্যোগে সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেলে প্রথম বিশ্ব জায়নবাদী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকে জায়নবাদ সংগঠিতভাবে মাথা তুলতে থাকে।

জায়নবাদ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল একটি মতবাদ। হার্জেল ইহুদিদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য একের পর এক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে ধর্ণা দিতে থাকেন। সেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে ফিলিস্তিনে, তাদের পুণ্যভূমিতে। অটোমান সাম্রাজ্যের হাতে থাকা ফিলিস্তিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশদের হাতে আসে। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার ব্যালফোর জায়নবাদী নেতা ব্যারন রথসচাইল্ডকে চিঠি লিখে জানান, ফিলিস্তিনে ইহুদি আবাসভূমি গড়ে তুলতে যা প্রয়োজন তাই করবে ব্রিটিশ সরকার। ব্যালফোর ঘোষণার পর ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি বাড়তে থাকে। এই ভূ-খণ্ডে আগে থেকে যে আরব ইহুদিরা বাস করতেন তারা মিজরাহি নামে পরিচিত ছিলেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপ থেকে ইহুদিদের আসা বাড়তে থাকে, বেলফোর ঘোষণার পর তা আরও বৃদ্ধি পায়। এই বাইরে থেকে আসা ইহুদিরা স্থানীয় আরবদের কাছ থেকে প্রথমে জায়গা কিনে নিয়ে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে তাদের সাথে স্থানীয় ফিলিস্তিনদের সাথে সংঘাত শুরু হয়। সংঘাত ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ মদতে আরও বাড়তে থাকে। ১৯২১ সাল ইহুদিরা 'হাগনাহ' নামে একটি আধাসমরিক বাহিনী তৈরি করে। এটি তৈরিতেও ব্রিটিশদের সায় ছিল।

১৯৩৩ সালে স্থানীয় ফিলিস্তিনিরা এই দখলদারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বড় আকারের প্রতিবাদ আন্দোলন করেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তা কঠোর হাতে দমন করে। ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত পিল কমিশন ফিলিস্তিনকে দুই ভাগে ভাগ করে তিন চতুর্থাংশে আরব এবং বাকি অংশে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয়। সেই প্রস্তাবে জেরুজালেম এবং বেথলেহেমকে দুই দেশের মধ্যবর্তী একটি ছিটমহল হিসাবে রাখার কথা বলা হয়। আরবরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও জায়নবাদীরা সমর্থন করে।

এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪২ সালে, যুদ্ধ চলাকালেই, জায়নবাদীদের বাল্টিমোর সম্মেলনে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব পাশ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পরে, হিটলারের শাসনকালে, জার্মানিতে ইহুদিদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার সংঘটিত হয়। প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে সে সময় হত্যা করা হয়। যুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ের পর একটি ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের জায়নবাদী দাবি জোরদার হয়। বিশ্ব জনমতও এর পক্ষে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত হয় জাতিসংঘ। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর সদ্যগঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে ইহুদি এবং আরবদের মধ্যে দুই ভাগ করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা এটা মেনে নেয়নি। আরব লীগের সাতটি দেশ (লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ট্রান্স জর্ডন, সৌদি আরব, ইয়েমেন ও মিশর) ১৯৪৭ সালে কায়রোতে বসে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা ফিলিস্তিনিদের সহায়তা করবে। ফিলিস্তিনের ইহুদিরা ১৯৪৭ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিনে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

ইসরায়েলের দখলদারিত্বের শুরু

জাতিসংঘের অনুমোদনের আগে থেকেই ফিলিস্তিনের জায়নবাদী নেতা ডেভিড বেন গুরিয়ান ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে আরব মুসলমানদের উচ্ছেদ করার তৎপরতা শুরু করেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস থেকেই এই ভূখণ্ডে শুরু হয় হিংস্র জায়নবাদী হামলা। হামলা করে ইহুদি সন্ত্রাসী সংগঠন হাগনাহ ও স্টার্ন গ্যাং। আরবদের নিশ্চিহ্ন করার এই পরিকল্পনার নাম ছিল 'প্ল্যান দালেত' বা 'প্ল্যান ডি'। এরমধ্যে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং সাথে সাথে ১৪ মে ইসরায়েলের ইহুদিরা ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হন ডেভিড বেন গুরিয়ান। ফিলিস্তিনের আরব অধিবাসীদের উপর মার্চ থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত চলে হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটতরাজ। ফলাফলে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ ফিলিস্তিনি আশেপাশের আরব দেশগুলিতে উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় নেন। এই ঘটনাকে আরবী ভাষায় 'আল নকবা' অর্থাৎ বিপর্যয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নভেম্বরে আরব লীগের দেশগুলো সম্মিলিতভাবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪৯ সালে যুদ্ধ শেষ হয়। আরবরা সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়। পশ্চিমা শক্তিগুলো, যারা বাস্তবে ইসরায়েলকে সহযোগিতা করে জয়ী করেছিল, তারা ওই অঞ্চলটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে– ইহুদিদের ইসরায়েল, আরবের ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং গাজা স্ট্রিপ। কিন্তু তাতে কোনো সমাধান হয়নি। শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। সংঘাত বাড়তে থাকে।

এরপর আরও তিনটি আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ হয়েছে। প্রতিটিতে আরবরা পরাজিত হয়েছে। আর সাথে বেড়েছে জায়নবাদী দখলদারিত্ব। প্রতিটি যুদ্ধের পর ইসরায়েল তার দখলকৃত এলাকা বাড়িয়েছে। ১৯৬৭ সালে গোলান উপত্যকা, পূর্ব জেরুজালেম এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ইসরায়েল তার কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে অবৈধভাবে জমি দখল, বসতি নির্মাণ, তাদের নাগরিক অধিকার হরণ– সবই করেছে ইসরায়েলের জায়নবাদী সরকার। আজ তাদেরই ভূমিতে ফিলিস্তিনিরা উদ্বাস্তুর মতো জীবন কাটাচ্ছে।

ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ আন্দোলন

ইজরায়েলি দখলদারির বিরুদ্ধে পাঁচের দশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল 'ফাতাহ' সৃষ্টি হয়। ১৯৬৭ সালে ইয়াসির আরাফাত এর নেতা হন। ১৯৬৪ সালে ফাতাহসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক শক্তি যৌথভাবে গড়ে তোলে 'প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন' বা 'পিএলও'। তারাই হয়ে ওঠে ফিলিস্তিনি জনতার প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন। পিএলও'' এর মধ্যে একাধিক বামপন্থী সংগঠন ছিল। তাদের অন্যতম হলো 'পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন' বা 'পিএফএলপি'। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এই সংগঠনের গেরিলারা সাত এবং আটের দশকে বেশ সাড়া ফেলেছিলেন। বিমান হাইজ্যাক করার মত অপারেশনও তাঁরা সফলভাবে করেছিলেন। শক্তি কমলেও এখনো লড়াইয়ের ময়দানে আছে পিএফএলপি।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পিএলওর প্রতিরোধের ধরণ ছিল দুই রকম। একদিকে বড় বড় গণজমায়েত, আবার তার সঙ্গে গেরিলা পদ্ধতিতে প্রতিরোধ। দুটোই তারা পাশাপাশি চালাতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রে সজ্জিত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে লড়ার কোনো সুযোগ কারও ছিল না। এই প্রতিরোধে পিএলও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থন পায়। বলে রাখা উচিত সমাজতান্ত্রিক শিবির শুরু থেকেই ইসরায়েলের প্রতিরোধযুদ্ধ সমর্থন করেছে ও সহযোগিতা করেছে। এমনকি ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে ইসরায়েল গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারা বলেছিল, আলাদা রাষ্ট্র না করে এক রাষ্ট্র থাকুক। কিন্তু জাতিসংঘে তখন বেশিরভাগই দুই রাষ্ট্র সমাধানের পক্ষে ছিলেন এবং সংঘাত এতো তীব্র ছিল যে, একরাষ্ট্রের মধ্যে তাদের অবস্থান সম্ভব নয় বলে বেশিরভাগই মত দিয়েছিলেন। পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই রাষ্ট্র সমাধান মেনে নেয়।

ইসরায়েলের সঙ্গে প্রতিরোধ সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পাশাপাশি বিশ্বের বিরাট অংশের সমর্থন পেয়েছিল পিএলও। এমনকি বাংলাদেশ থেকেও একঝাঁক বামপন্থী যুবক ফিলিস্তিনে যান আরব গেরিলাদের হয়ে লড়তে। আশির দশকে পিএলওর নেতৃত্বে ঘটে প্রথম 'ইন্তিফাদা' বা 'গণজাগরণ'। টানা ছয় বছর ধরে এই অসম প্রতিরোধ সংগ্রাম চলে। ইন্তিফাদার সময়েই ইসরায়েলি সেনাদের দিকে ফিলিস্তিনি যুবকদের পাথর ছোঁড়ার দৃশ্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইন্তিফাদার সমর্থনে, ইসরায়েলের দখলদারির বিরুদ্ধে দেশে দেশে মিছিল ও প্রতিবাদ সংঘটিত হয়।

প্রথম ইন্তিফাদার অবসান ঘটে ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির মাধ্যমে। এই চুক্তি করা ছিলো পিএলওর একটা ঐতিহাসিক ভুল। তারা নরওয়ের রাজধানীতে অত্যন্ত গোপনে ইসরায়েলের সঙ্গে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়। অসলো চুক্তির মাধ্যমে স্থির হয়, ইসরায়েল গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকে সরে আসবে। কিন্তু ফিলিস্তিনি শরণার্থী, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ইহুদি বসতি ও জেরুজালেম প্রসঙ্গে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য এতে ছিল না।

চুক্তির মাধ্যমে ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করলো, কিন্তু ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজার দখল ছাড়লো না। ইহুদি বসতি আরও বাড়লো। চুক্তির মধ্য দিয়ে প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল অথরিটি (পিএনএ) গঠিত হয় এবং স্থির হয়, পরবর্তী পাঁচ বছর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী সরকার হিসাবে সংঘাত নিরসনে আলোচনা চালিয়ে যাবে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়।

দখলদারের কাছে চুক্তি কত একটা কাগজ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এই চুক্তির কারণে ফিলিস্তিনিরা পিএলওর উপর সকল আস্থা হারালো। চুক্তির অসম্পূর্ণতা শুধু নয়, চুক্তি করার এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমেই পিএলও তার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে কালিমালিপ্ত করলো। চুক্তি করার আগে পিএলও নেতৃত্ব ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যারা এতদিন লড়েছেন তাদের মতামত পর্যন্ত নেননি। চুক্তিটাও করেছেন গোপনে। অসলো চুক্তি পিএলওকে নৈতিকভাবেও দুর্বল করে দেয়। এই চুক্তির প্রতিবাদে বামপন্থী পিএফএলপি গেরিলারা পিএলও ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এই গেরিলারা বর্তমান যুদ্ধে হামাসের সাথে আছেন।

হামাসের আবির্ভাব

আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর ১৯৭৩ সালে 'মুজামা আল ইসলামিয়া' নামে একটি সামাজিক জনকল্যাণমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ আহমেদ ইয়াসিন। ১৯৮৭ সালে এই সংগঠনটিই 'হামাস' প্রতিষ্ঠা করে। মুজামা আল ইসলামিয়া ও পরবর্তীতে হামাস ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পায়। কারণ হামাস ছিলো পিএলওর বিরুদ্ধে। অসলো চুক্তির পর পিএলওর গ্রহণযোগ্যতা কমতে থাকে, হামাসের বাড়তে থাকে। আবার হামাস ও পিএলওর মধ্যে সংঘাতও শুরু হয়।

হামাস রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠী, আর পিএলও একটি উদার, ধর্মনিরপেক্ষ প্লাটফর্ম। ইসরায়েল সরকার চেয়েছিল এই দুই শক্তির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হউক, তাতে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার সংগ্রাম দ্বিধাবিভক্ত হবে। ফলে তারা পিএলওর বিরুদ্ধে হামাসকে সমর্থন দিতে থাকে। ইয়াসির আরাফাত মারা যাওয়ার পর পিএলওর অবস্থা আরও খারাপ হয়। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের সরকারে থাকা পিএলও নেতারা নানা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এদিকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলি দখলদারিত্ব ছিল। ইসরায়েলি সেনারা গাজার দখল ছাড়লে সেখানে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে হামাস জয়লাভ করে। হামাস ক্ষমতায় আসার পর ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০২১ সালে গাজায় নৃশংস হামলান চালিয়েছে ইসরায়েল। হামাসও পাল্টা হামলা করেছে ইসরায়েলে।

বর্তমান পরিস্থিতির সূত্রপাত

এবার হামাস নিজেরাই প্রথমে হামলা করেছে। তাদের হামলায় অনেক ইসরায়েলি নিহত হয়েছেন, অনেকে বন্দী হয়েছেন। হামাস এই সময়ে কেন এ হামলা করতে গেল এ নিয়ে বিভিন্নরকম মতামত আছে। সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে তা হলো, যে আরব দেশগুলোর বেশিরভাগই ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিত না, তারা ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা উদ্যোগ নিচ্ছে। এটা যদি সফল হয় তাহলে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার সংগ্রাম অনেকখানি পিছিয়ে পড়বে। এটাকে আটকাতেই হামাসের এই হামলা। আবার সাম্প্রতিক সময়ে আল আকসা মসজিদে নৃশংস হামলারও জবাব দেয়ার প্রয়োজন ছিল হামাসের।

হামাসের এই আক্রমণে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত যে রূপকথা বিশ্ব মিডিয়াতে ভাসছিল– সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আকাশপথে তাদের আয়রন ডোম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে গেছে হামাসের রকেট। আর ইসরায়েল এর বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নিয়েছে সেটা সকলরকম যুদ্ধের নিয়মের ঊর্ধ্বে এবং ভয়াবহ নির্মম, নিষ্ঠুর। তারা সাধারণ গাজাবাসীর উপর আক্রমণ করেছে। গাজার গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করেছে। শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ আসার রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছে। হাসপাতালে, শরণার্থী শিবিরে বোমা হামলা করছে। রুগী পরিবহনের অ্যাম্বুলেন্সে বোমা ফেলছে।

ইসরায়েলের সকল জনগণ কি তাদের সরকারের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করে

ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টি (মাকি) ইসরায়েল সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেছে। নিন্দা করেছে বামপন্থী দলগুলোর জোট 'হাদাশ'। তারা বলছে এই হামলার দায় ইসরায়েলের সরকারের। ইসরায়েল যেভাবে বছরের পর বছর ধরে ফিলিস্তিন দখল করে আছে, নিপীড়ণ চালাচ্ছে– তার ফলশ্রুতিতে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবাদ করায় ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির (মাকি) সাংসদ ওফের কাসিফকে ৪৫ দিনের জন্য সাসপেন্ড করেছে সংসদীয় এথিক্স কমিটি। প্রতিবাদের কারণে শতাধিক ইসরায়েলিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এক হতে হবে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদিদের উপর নির্মম অত্যাচার হয়েছিল। হিটলার সেটা করতে পেরেছিলেন উগ্র জাত্যাভিমান অর্থাৎ নাৎসিবাদ সৃষ্টি করে। আজ সেই ইহুদিদের উগ্র জাত্যাভিমান জায়নবাদের প্রসার ঘটিয়ে একটা জনগোষ্ঠীকে বিলীন করে দিতে চাইছে ইসরায়েলি শাসকরা। এটা কেবল মুসলমানদের লড়াই নয়। এটা বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের লড়াই। ইসরায়েলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদ দখলের জন্য সেখানকার দেশে দেশে সে এই সংঘাত বাঁধিয়ে রেখেছে, নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে। ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাহারাদার। ইসরায়েলকে তাই সে কখনও হাতছাড়া করতে দেবে না। তাই এটিকে শুধু মুসলিমবিদ্বেষ হিসেবে ভাবলে চলবে না। তেল ব্যবসায়ী কর্পোরেট টাইকুনদের কাছে ধর্ম বলে কিছু নেই। তাদের ধর্ম মুনাফা। মুনাফাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র ধর্ম। তাই ইহুদিবিদ্বেষ ছড়িয়ে, ইসলামী রক্ষণশীল মৌলাবাদী স্লোগান তুলে এই লড়াইয়ে জেতা যাবে না।

ইহুদি ধর্ম আর জায়নবাদ এক জিনিস নয়। তাই তো খোদ আমেরিকায় হাজার হাজার ইহুদি রাস্তায় নেমেছেন, মেট্রো স্টেশনে বিক্ষোভ করেছেন, ক্যাপিটেল হিলে বিক্ষোভ করেছেন। ইহুদি যাজকরাও (যাদের রাব্বি বলা হয়) ছিলেন সেখানে। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ইউরোপে। জার্মানীতে ফিলিস্তিনের পতাকা উড়িয়ে তাদের সমর্থনে মিছিল বের করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর লক্ষ লক্ষ লোক সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাস্তায় নামছেন প্রতি সপ্তাহে। সর্বশেষ সমাবেশে সেখানে পাঁচ লক্ষ লোকের জমায়েত ঘটেছে। গত ৪ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে হাজার হাজার মানুষ ফিলিস্তিনের পক্ষে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিলেন। তারা স্লোগান তুলেছেন, "বাইডেন, তুমি লুকাতে পারবেনা।" প্রতিবাদ হয়েছে ইউরোপের দেশে দেশে। এই প্রতিবাদীদের সবাই ফিলিস্তিনের উপর এই অন্যায় বন্ধ হউক সেটা চান। চান তাদের ভূমির অধিকার। এই সংগ্রামী পৃথিবীটাই আসল পৃথিবী। এটাই ভবিষ্যতের যুদ্ধবিহীন সাম্যের সমাজ গড়ে তুলবে।

সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র

শেষ পৃষ্ঠা

১১ বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৩

গাজার ধ্বংসস্তুপ আজ গোটা বিশ্বের হৃদয়

গাজার শিশুরা কালি দিয়ে হাতে নিজের নাম লিখে রাখছে, যাতে মৃত্যুর পর বেওয়ারিশ লাশ হয়ে যেতে না হয়। কোন গোপনীয়তা রাখার উপায় নেই, পানি নেই– তাই পিল খাচ্ছেন নারীরা, ঋতুস্রাব বন্ধ রাখার জন্য।

যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম ভেঙে হাসপাতালে মিসাইল ছুঁড়েছে ইসরায়েল, ছুঁড়েছে জাতিসংঘ শরণার্থী শিবিরে। উত্তর গাজার ১১ লক্ষ বাসিন্দাকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ইসরায়েল। প্রাণভয়ে তারা যখন দক্ষিণের দিকে পালাচ্ছিলেন, তখন তাদের উপর বোমা ফেলা হলো। নিহত হলেন ৭০ জন মানুষ, যার মধ্যে ১২ জন শিশু।

প্রতি মুহূর্তে আহত মানুষ আসছেন হাসপাতালে। এসে কাতরাচ্ছেন, কিন্তু চিকিৎসা পাচ্ছেন না। চিকিৎসার সরঞ্জাম নেই, ওষুধ নেই। গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, পানির লাইন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তৃষ্ণায় নর্দমার নোংরা পানি, সাগরের লোনা পানি খাচ্ছেন তারা। বড়রা খাচ্ছেন, খাচ্ছে শিশুরা।

গর্ভবতী নারীরা জানেন না, তার সন্তান জন্মাবে কি না, জন্মালেও বাঁচবে কি না, তার সন্তানকে তিনি কোলে নিতে পারবেন কি না।

গাজায় যুদ্ধ নয়, চলছে গণহত্যা। নির্বিচারে, নির্বিবাদে সুপরিকল্পিত গণহত্যা। বিশ্বের মানচিত্র থেকে ফিলিস্তিনকে মুছে দেয়ার চেষ্টা চলছে। গোটা বিশ্বের মানবতার তথাকথিত কণ্ঠস্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলছে, ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। মানব ইতিহাসে এত ভয়ঙ্কর ও আগ্রাসী আত্মরক্ষা কেউ কখনও দেখেনি।

ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম

ফিলিস্তিনে অনেক আগে থেকে ইহুদিরা বাস করতেন। জেরুজালেমে তাদের মন্দির ছিল। আনুমানিক ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা জেরুজালেমে মন্দির ৭ম পৃষ্ঠায়

নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি

খাদ্যপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করাই একমাত্র সমাধান

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে দায়ী করে গেছেন। এই মিথ্যা কথাটা এখন দিনের আলোয় পরিস্কার হয়ে পড়ায় তাদের মুখ থেকে কিছু কিছু সত্য কথা বের হচ্ছে। সম্প্রতি কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, 'সিন্ডিকেট করে আলুর কোল্ড স্টোরেজগুলো সাধারণ মানুষের টাকা শুষে নিয়েছে। আমরা অসহায় হয়ে দেখেছি, কিছু করতে পারিনি। আমরা বেশি চাপ দিলে তারা বাজার থেকে আলু তুলে নিয়ে যায়।'

একইরকম মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। গত বছরের জুন মাসে এক টিভি চ্যানেলের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বাজারে চালের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে আকিজ, সিটি, বসুন্ধরা, এসিআই ও স্কয়ার এই ৫টি কর্পোরেট গ্রুপের নাম উল্লেখ করেন।

খবরে প্রকাশ, ভোজ্যতলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ৫টি কর্পোরেট গ্রুপ– সিটি, টিকে, মেঘনা, এস আলম ও বাংলাদেশ এডিবল ওয়েল লিমিটেড।

গমের বাজারে দাম বাড়িয়ে টাকা লুট করার ক্ষেত্রে সিটি গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ, আকিজ গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ এবং বড় মিল মালিকরা অগ্রগণ্য। এদের নাম সকলে জানে। পাইকারি বাজারের সাথে যুক্ত সকলে জানে– দাম কেন বাড়ে, কারা বাড়ায়।

সম্প্রতি ব্রয়লার মুরগীর দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। দেখা গেলো সেখানেও সিন্ডিকেট কোন কারণ ছাড়া দাম বাড়িয়ে বাড়তি টাকা জনগণের পকেট থেকে বের করে নিয়েছে। চারটি কর্পোরেট গ্রুপের সিন্ডিকেট ব্রয়লার মুরগীর বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। এরা হলো কাজী ফার্মস লিমিটেড, আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড, সিপি বাংলাদেশ এবং প্যারাগন পোলট্রি অ্যান্ড হ্যাচারি লিমিটেড। একইভাবে ডিমের সিন্ডিকেটে এই চারটির সাথে আরও ছয়টি কর্পোরেট গ্রুপ যুক্ত। এই দশটি প্রতিষ্ঠানের নামে প্রতিযোগিতা কমিশন মামলাও করেছে।

বিশ্ববাজারে গমের দাম গত তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন, চিনি ও ভোজ্যতেলের দাম কমেছে। কমেছে পরিবহন খরচ। তারপরও আমাদের দেশে দাম বাড়িয়ে অতিরিক্ত মুনাফা করছে কর্পোরেট গ্রুপগুলো। খাদ্যের বাজারে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

দূতাবাসে ধর্ণার রাজনীতি ও সাম্রাজ্যবাদ

"২০০১-এ আমরা সরকারে আসতে পারলাম না। কারণ গ্যাস বিক্রি করার মুচলেকা দেইনি বলেই আমাকে আর ক্ষমতায় আসতে দেয়া হল না। বৃহৎ দুটি দেশ আর প্রতিবেশী দেশের চাহিদা পূরণ করতে পারিনি।" এটা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের পরাষ্ট্রমন্ত্রী অত্যন্ত খোলাখুলি বলেছেন,"শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে ভারতকে অনুরোধ করেছি।"

বিএনপি দিনে-রাতে বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের কাছে দৌড়ে যায় উল্লেখ করে এই মাসে এক শান্তি সমাবেশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন,"আমি জানিনা পিটার হাস তাদের কী স্বপ্ন দেখিয়েছেন। পিটার হাস কী করবেন? নিষেধাজ্ঞা দেবেন? তাঁদের মুরব্বিদের সঙ্গেও আমাদের কথা হয়ে গেছে। উচ্চ পর্যায়েও কথাবার্তা হয়ে গেছে। তলে তলে সব ঠিক হয়ে গেছে, দৌড়াদৌড়ি করে লাভ হবে না।"

উক্তিগুলো শুনে বোঝা যায় এদেশের রাজনীতির সাথে সাম্রাজ্যবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। এগুলো অসংখ্য ঘটনা ও উক্তির মধ্যে কয়েকটি মাত্র। এদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর প্রভাব বুঝতে হলে আমাদেরকে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদ ও তার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্মেও ইতিহাসটা ভাল করে বুঝতে হবে।

১৯৭১ সালে এমন এক সময়ে বাংলাদেশের জন্ম, গোটা বিশ্বে যখন পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ করেছে। ব্যবসায় অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুঁজিবাদের যে স্বাভাবিক বিকাশের প্রক্রিয়া– তার সময় শেষ হয়ে গিয়ে পুঁজিবাদ তখন একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তরে উপনীত হয়েছে। বড় বড় পুঁজিবাদী দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়েছে এবং গোটা বিশ্বের বাজারকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার জন্য তাদের মধ্যে চলছে তীব্র প্রতিযোগিতা। এই বাজার ভাগাভাগির জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে ইতিমধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। ফলে এই সময়ে জন্ম নেয়া একটি দেশ যখন পুঁজিবাদী পথে যাত্রা করে তখন সেই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নতজানু থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের একটা ভূমিকা ছিল। কিন্তু ভারতের জনগণের ভূমিকা আর ভারতের শাসকশ্রেণির ভূমিকা একইরকম ছিল না। ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের সহযোগিতাসহ যুদ্ধের সময় এদেশের জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেছে ভারতের জনগণ। তাদের সহযোগিতার প্রকৃতি ছিল নিঃস্বার্থ ও মানবিক। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ভারতের শাসকগোষ্ঠী সেদিন এই যুদ্ধকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে দুর্বল করা ও নতুন বাজারের দখল নেয়ার পথ হিসেবেই দেখেছে। এটি শুধু কথার কথা নয়, এটি ঐতিহাসিকভাবেও সত্য। যুদ্ধের সময় ভারতের ভূমিকা, যুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা ও ভারত রাষ্ট্রের ভূমিকার মধ্যে এই বার্তা স্পষ্ট ছিল। আর আজ যখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বয়স ৫০ বছরেরও বেশি তখন তো সেটা দিনের আলোর মতো পরিস্কার।

ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি শ্রেণি তার জন্মলগ্ন থেকেই সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব ও কর্তৃত্বের মধ্যেই নিজেদের বিকাশ ঘটিয়েছে। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেই এদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে। এই সময়ে জন্ম নেয়া পুঁজিবাদী একটি দেশের ক্ষেত্রে এটা একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

এদেশ যখন স্বাধীন হয়, চীন তখনও সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উপনীত হয়নি। সমাজতান্ত্রিক চীন তখনও অন্য দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতো না। পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে দেশ পরিচালিত হতো না বিধায় অন্য দেশের বাজার দখলের কোন প্রয়োজন চীনের ছিল না। চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছে নাকি কৌশলগতভাবে নিশ্চুপ ছিল– সেটা অন্য বিতর্ক। কিন্তু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের বাজার দখল ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিস্তারের কোন উদ্দেশ্য ও বাস্তব পরিস্থিতি তখন চীনের ছিল না। ৩য় পৃষ্ঠায়

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র পক্ষে শফিউদ্দিন কবির কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩। website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org